রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে

দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার

নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকার ১৮২৯ সনের ১৩ জুন তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয় গৌড়দেশে—

... যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে ...

বিশিষ্টরূপে খ্যাত হওয়া এই সকল লোককে একটি নতুন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। "এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত" বলে দাবি করবার পরে স্পেন এবং পোল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, এই নতুন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়নি যে সকল দেশে, সে সকল দেশে জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং বশ্যতা সীমাহীন। কিন্তু যে সকল দেশে এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভব এবং আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, সে সকল সাধারণ মানুষের উন্নতি হয়েছে বহু দিক থেকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় খোদ ইংল্যাণ্ডকে। দেখানো হয় যে, সে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ থেকে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকে নির্মূল করার জন্য জনসাধারণ—

...ওলিবর ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র চারল্‌স্ নামক রাজাকে শিরচ্ছেদ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংল্যাণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন।

এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে বাঙলার 'সমুদয় ধন' তাবৎলোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশা প্রকাশ করেই যে একটি বিশেষ ঘোষণা করা হয়, সেটা আমাদের একটু আশ্চর্য করে তোলে ঃ

... লোকেরদিকের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।[১]

বাঙলায় আবির্ভূত যে নতুন শ্রেণীর প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাজার শিরচ্ছেদের ইতিহাস শুনিয়ে বাঙলার স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথাও বলা হয়, সেই শ্রেণীটিকে অভিহিত করা হয় মধ্যবিত্ত নামে। বাঙলার জনসমষ্টির একটি অংশের মধ্যবিত্ত বা মধ্যশ্রেণী নামক একটি সুস্পষ্ট নতুন শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার পরে তার শ্রেণীগত অবস্থা ও অবস্থান, প্রত্যাশা ও প্রয়োজন, প্রস্তুতি ও উদ্দেশ্য এবং সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রথম ফসল এই প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন বঙ্গদূত পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী রামমোহন রায়।[২] আর রামমোহন রায়ই ছিলেন এই উদীয়মান নতুন মধ্যশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

তবে নতুন বলতে যদি এই মধ্যশ্রেণীকে পুরোপুরিভাবে বৃটিশ শাসনের সৃষ্টি বলে গণ্য করা হয়, তা হলে নিশ্চয় ভুল হবে। নতুন বলতে যা বোঝায়, তা হলো কোনও নির্দিষ্ট সমাজে পূর্বে যা ছিল, তার পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ।[৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও যেমন ছিল, পরেও তেমনই ছিল বাঙলার একটি মধ্যশ্রেণী। মুসলিম শাসনের যুগে মুসলিম লোকেরও এই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম শাসন ব্যবস্থার নিজস্ব চরিত্রই তা হতে দেয়নি। তাই মুসলিম আমলের মধ্যশ্রেণীতেও ছিল প্রধানত হিন্দুরাই।[৪] ইংরেজ শাসনে এই মধ্যশ্রেণীটির যে পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ হয়, সেটা শুধু পরিমাণগত নয়। সীমিত হলেও তার গুণগত দিক ছিল। এই সুনির্দিষ্ট অর্থেই ইংরেজ আমলের মধ্যশ্রেণীকে একটি নতুন শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা ঠিক।

সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম লিখেছেন ঃ

> In every society, there are social groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for the society. We call these *intelligentsia*.[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঙালি সমাজ তার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে পেয়েছিল এই intelligentsia বা বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিসম্পন্ন বিভাগকে। প্রথম থেকেই নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এই বিভাগটি তাদের চিন্তা ও কার্যকলাপকে শুধু বাঙলার ভেতরেই সীমিত করে রাখেনি। তাদের চিন্তা ও কার্যকলাপকে অতি দ্রুত তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল সমগ্র ভারতে। কটনের ভাষায় তারাই "The Noice and brain of the country" হয়ে দাঁড়ালো। তারাই নিয়ন্ত্রণ করলো "public opinion from Peshwar to Chittagong."[৬] যদুনাথ লিখেছেন যে এই শিক্ষিত গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ—

> ...became a path-finder and a light-bringer to the rest of India ... In ...Bengal originated every good and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India.[৭]

রবার্ট মিচেল্‌স্‌-এর মতে যে পুরোহিতচিত গুণাবলী (priestly qualities) এবং যে পুরোহিতচিত কার্যাবলী (priestly functions) দিয়ে গঠিত হয়েছে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, বাঙলার মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই তাতে বিশেষ কোনও ঘাটতি ছিল না।[৮]

ইংরেজ শাসনে বাংলার পূর্বতন মধ্যশ্রেণীটির পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ হওয়ার ফলে তারা বাংলা ও ভারতের অতীতের সঙ্গে বরাবারই একটি যোগসূত্র রক্ষা করেছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ কাব্য স্মৃতি এবং জীমূতবাহন, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার রঘুনন্দন প্রমুখের ব্যাখ্যা এবং বাংলা ও ভারতের ইতিহাস এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থার ভিত্তিতে তাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিনিধি রামমোহন রায় ইউরোপের আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করে অভিমত গঠন করেছেন, বক্তব্য এবং দাবিও উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং কর্মের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শুধু

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের নয়, পাশ্চাত্যের তুলনামূলকভাবে খুব অল্প বয়স থেকেই স্বাধীন জীবনযাপনের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নয়ন, ধর্মীয় সংস্কার এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষ ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। "সে জন্যই তিনি এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃত বলে শুধু ভারতেই নয়, ইংল্যাণ্ডে স্বীকৃত হয়েছিলেন।"[৯] নিজের প্রণীত তত্ত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটি আন্দোলন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের যেমন সূত্রপাত হয়েছিল অ্যারিস্টোটলের নামের সঙ্গে, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসেরও তেমনই সূত্রপাত হয়েছে রামমোহন রায়ের নামের সঙ্গে।[১০] সে জন্যই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের উদীয়মান মধ্যশ্রেণী রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পেয়েছিল তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রথম এবং প্রধান প্রণেতা ও নেতাকে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি রামমোহন রায়ের যে ভালবাসা ছিল, তাকে অপরিসীম বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। উইলিয়াম অ্যাডামের ভাষায় ঃ

> He did not seek to limit the enjoyment of it to any class, or colour, or race, or nation or religion. His sympathies embraced all mankind.[১১]

সকল প্রকার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল, সেটা ভৌগোলিক পরিসীমা অতিক্রম করে সমগ্র মনুষ্য সমাজকে উদারভাবেই আলিঙ্গন করলো। এমন ঔদার্য পৃথিবীর অন্য দেশে অতীতে দেখতে পাওয়া গেলেও ভারতে যে কখনোই পাওয়া যায়নি, সে বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারও কোনও সন্দেহ পোষণ করেননি।[১২] রামমোহন রায়ের আদর্শানুসারে কোনও জাতির পক্ষেই অন্য কোনও জাতির স্বাধীনতা হরণ বা পদদলিত করা উচিত নয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ যাতে এই উচ্চাদর্শ গ্রহণ করতে পারে বা তার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, সে জন্য তিনি সেই সব বাধা-বিপত্তিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন যেগুলি বিশ্বের মানবজাতির মিলনের পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে চীনের প্রাচীর তুলে। একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দুরদৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই সব মৌলিক নীতি বা আদর্শ যেগুলির ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লীগ অব নেশানস। একজন বাস্তব রাজনীতিজ্ঞের মতো একটি আন্তর্জাতিক আদালতের পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন রামমোহন রায়। এ কথা শুনতে কার না ভাল লাগে যে ১৮৩১ সনেই রামমোহনের সিদ্ধান্ত ছিল ঃ

> ...that not religion only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries

feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

সেজন্যই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কংগ্রেস বা মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুরোধ করলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি তাঁকে স্পষ্ট করে লিখলেন ঃ

By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilized countries with constitutional governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction or both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.[১৩]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর যেখানে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল, তার প্রতি রামমোহন রায়ের ছিল যেমন সুতীব্র আগ্রহ, তেমনি সুগভীর সমর্থন। নেপল্‌সের জনগণ তাদের স্বৈরাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে একটি সাংবিধানিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া এবং নেপল্‌সের সম্মিলিত বাহিনী সেই সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে আবার সেখানে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতায় এই সংবাদ এসে পৌঁছানোর পরে রামমোহন খুবই দুঃখিত হলেন।[১৪] ১৮২১ সনের ১১ আগস্ট তারিখে জে এস বাকিংহামকে লিখিত একটি পত্রে ব্যক্ত হল তাঁর সেই দুঃখ ঃ

...I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they enjoy now. Under these circumstances I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.[১৫]

আবার স্পেনের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের জোয়াল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি উপনিবেশের মুক্ত হওয়ার সংবাদ যখন কলকাতায় এসে পৌঁছল, রামমোহন রায় তখন বিজয়ীর আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। ঘটানাটি উদ্‌যাপন করলেন তিনি তাঁর ষাটজন ইউরোপীয় বন্ধুকে একটি সন্ধ্যাকালীন ভোজসভায় আপ্যায়ন করে। এই ষাটজন ইউরোপীয় বন্ধুর প্রায় সকলেই পরিচিত ছিলেন কোম্পানি-সরকারের শত্রু বলে। পরে আবার এদের প্রসঙ্গে আসব। এই ভোজসভায় রামমোহন রায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৮২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এডিনবরা ম্যাগাজিনে বলা হল ঃ

But the lively interest he took in the progress of South American emancipation, eminently marks the greatness

and benevolence of his mind, 'What!' replied he, (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans and by a speech composed and arrival of the important news of the success...), ought I to be insensible to the 'What !' sufferings of my fellow-creaters wherever they are, or however unconnected by interests, religion, and language?'[১৬]

এই স্পেনেরই অভ্যন্তরে উল্লিখিত ঘটনার বহু পূর্ব থেকে যে সংগ্রাম চলছিল, তাতে রামমোহন রায় সমর্থন করেছিলেন উদারপন্থীদের। স্পেনের উদারপন্থীরাও এটা জানতেন।

ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য জাহাজে ওঠার কয়েকমাস পূর্বে কলকাতায় ১৮৩০ সনের ফরাসি বিপ্লবের সংবাদ এল। এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে এই বিষয়টি ছাড়া তিনি আর অন্য কোনও আলোচনা করতে বা কথাবার্তা বলতেও পারতেন না। এই বিপ্লবকে তিনি স্বাধীনতার বিজয় হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং আনন্দিত হলেন ঠিক সেইভাবেই।

সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সময় কেপ্ অব হোপে রামমোহন রায় তাঁর পায়ে ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিলেন। তার ফলে, পরবর্তী আঠারো মাসের মতো তিনি প্রায় খোঁড়া হয়েই ছিলেন এবং ব্যথাও ছিল তাঁর একটি পায়ে। তা সত্ত্বেও তিনি দুটি ফরাসি রণতরী দেখতে গিয়েছিলেন। এই রণতরী দুটি স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের সুগৌরবময় ত্রিবর্ণের বিপ্লবী পতাকা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল টেবল উপসাগরে। ত্রিবর্ণের পতাকা দুটি দেখার সঙ্গেই তাঁর মনে যে উৎসাহ বা প্রেরণার আগুন জ্বলে ওঠে, সেটা তাঁকে ভুলিয়ে দিল তাঁর পায়ের ব্যথা। জাহাজের ফরাসিরা তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করেন। জাহাজে তুলে নিয়ে তাঁরা তাকে নিয়ে গেলেন সেই বিপ্লবী পতাকার নীচে। ফরাসি দেশের বিপ্লবী জনগণের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় জ্ঞাপন করলেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। ফেরার সময় পায়ের ব্যথার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী রামমোহন রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন ঃ

'Glory, Glory, Glory to France !'[১৭]

রামমোহন রায় যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সে দেশে চলছিল তৃতীয় সংস্কার বিল (Third Reforms Bill) নিয়ে প্রবল আন্দোলন। সমগ্র দেশেই উত্তেজনা। বিলটির সাফল্যের জন্য রামমোহন রায় আগ্রহী ছিলেন অনেক পূর্ব থেকেই। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পরে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। হাউস্ অব্ কমন্স-এ বিলটির আলোচনার সময় রামমোহন বিতর্ক শুনতে যেতেন নিয়মিতভাবে। হাউস্ অব্ কমন্স্ অনুমোদন করে দেওয়ার পরে বিলটিকে যখন পাঠিয়ে দেওয়া হল হাউস্ অব্ লর্ডস্-এ, তখন প্রবল উত্তেজনার সঙ্গেই সমগ্র ইংল্যাণ্ড শেষোক্ত সভার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিলটিতে এমন কিছু প্রস্তাব ছিল যেগুলির দ্বারা ভারতেরও উপকার হওয়ার কথা। অতএব বিলটির সঙ্গে ভারতের স্বার্থও জড়িত ছিল। তা ছাড়াও বিলটিতে যে সমস্ত সংস্কারের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হলে সেগুলির ফল হত সুদূরপ্রসারী। তাই রামমোহন বিলটিকে শুধু ইংরেজ জনগণের ব্যাপার বলে গ্রহণ করেননি। সমগ্র বিশ্বের এবং বিশেষ করে ভারতের অনেক কিছুই এই

বিলটির সাফল্যের সঙ্গে জড়িত বলেই তিনি বিবেচনা করলেন। সেজন্যই একদিকে তাঁর ব্রিস্টল যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করে দিয়ে তিনি থেকে গেলেন লণ্ডনে। অধীর আগ্রহের সঙ্গে লর্ডদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীমতী কিড্‌ডেলের কাছে লিখিত একটি পত্রে বলেন যে বিলটির সাফল্যের উপরেই "the welfare of England, nay of the world, depends." অন্যদিকে ১৮৩২ সনের ২৭ এপ্রিল তারিখে লিখিত একটি পত্রেও তিনি যা বলেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় সংস্কার বিলের আন্দোলনকে তিনি নিছক সংস্কারপন্থী এবং সংস্কারবিরোধীদের সংগ্রাম বলেও গ্রহণ করেননি। তিনি এই সংগ্রামকে বিশ্বজোড়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অন্যায়ের সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয়-সাধনও দেখতে পেয়েছেন। রামমোহন রায়ের এই পাণ্ডিত্য ও কর্মের মধ্যে উল্লিখিত দুটি সমন্বয় হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন, যেটি ছিল অতীতের মধ্যশ্রেণীর পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ। তা ছাড়া আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি সাফল্যের সাহায্যে অধিকতর বা চূড়ান্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই যে রামমোহন রায়ের পক্ষে ওই দুটি সর্বজনস্বীকৃত সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছিল, সেটা বিস্মৃত হলে ভুল হতে বাধ্য।

রামমোহন রায়ের যুগে তাঁর মতো রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এবং বিশেষ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুগভীর পণ্ডিত এবং বহুভাষবিদ্ কর্মযোগী মানুষ আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। বহুবিধ অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত এবং পরিপুষ্ট তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা প্রকৃত অর্থেই ছিল অত্যন্ত উদার, প্রগতিশীল, সর্বজনীন, যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী। তাঁর মধ্যে প্রাচীন পৃথিবীর সত্য জ্ঞান এবং আধুনিক পৃথিবীর সত্য প্রাণ-চেতনার সমন্বয় হয়েছিল বলে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন সেই ঐতিহাসিক ধারাকে যেটা তাঁর দেশবাসীকে একটি আধুনিক জাতিতে পরিণত করবার পক্ষে ছিল উপযুক্ত। সাধারণ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তাঁর সুতীব্র আগ্রহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন ঃ

> The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers; but between liberty and oppression throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong.[১৮]

ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় সংস্কার বিলের পরাজয় সমগ্র মনুষ্যসমাজের অমঙ্গল হবে বলেই বিশ্বাস করতেন রামমোহন রায়। তাই তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন ঃ

> ...in the event of the Reform Bill being defeated, I would renounce my connection with this country.

ইংল্যাণ্ডের লঙ্ পার্লামেন্টে গ্র্যাণ্ড রেমোনস্ট্র্যান্স (Grand Remonstrance)-এর পরাজয় হলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকা চলে যাবেন বলে ওলিভার ক্রমওয়েল যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রামমোহনের উল্লিখিত ঘোষণাটি আমাদের সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত লর্ডরা আর বাধা দিলেন না। বিলটিকে তাঁরা অনুমোদন করলেন।

শ্রীর‍্যাথবোনেকে লিখিত যে পত্রে তিনি তাঁর প্রকাশ্যে ঘোষিত এই প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন, তাতে তিনি আরও যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলি আমাদের দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি ও অনাচার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় ঃ

> The nation can no longer be a prey of the few who use to fill their purses at the expense, nay to the ruin of the people, for period of upwards of fifty years.

বিলটির অনুমোদনের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রগতিশীল বা সংস্কারপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করেই রামমোহন রায় লিখলেন ঃ

> The ministers have honestly and firmly discharged their duty and provided the people with means of securing their rights. I hope and pray that the mighty people of England may now in like manner do theirs, cherishing public spirit and liberal principles at the same time banishing bribery, corruption, and selfish interests from their public proceedings.[১৯]

স্বাধীনতা অর্জন, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসনের প্রবর্তন এবং মানবাধিকারের সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর যেখানেই যাঁরা সংগ্রাম করতেন, রামমোহন রায় যে তাঁদের দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্মনির্বিশেষে সমর্থন করতেন, এ কথা তাঁরাও জানতেন, তাঁরাও স্বীকার করতেন। ১৭৯১ সনের ফরাসি সংবিধানের আদর্শে প্রণীত ১৮২২ সনে কার্ডিজে ঘোষিত স্পেনের সংবিধান সম্পর্কে বেনেদেত্তো ক্রোচে লিখেছিলেন যে এই সংবিধান থেকেই নতুন স্পেনীশ জনগণের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। লা কোম্পানিয়া ফিলিপিনাস কর্তৃক প্রকাশিত এই সংবিধানের একটি কপি স্পেনের সংবিধানিক সরকারের প্রতিষ্ঠাতাগণ রামমোহন রায়কে ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সনের মধ্যে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা লিখেছিলেন ঃ

> AL / LIBERALISMO / DEL /
> NOBLE, SABIO, Y VIRTUOSO /
> BRAMA / Ram-Mohun Roy /[২০]

আমেরিকার প্রগতিশীলদের যে অগ্রদূতেরা দাসপ্রথা বিলুপ্তির জন্য, একটি ব্যাপক সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁরাও রামমোহনের উদার, প্রগতিশীল যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী চিন্তা ও কর্মের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ওয়াশিংটনে ১৮৩০ সনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহাসম্মেলন। মহাসম্মেলনের জনৈক সদস্য প্রকাশ করেন একটি পুস্তিকা। পুস্তিকাটি ছিল দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি অভিভাষণ। লেখক নিজের নামে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেননি। রামমোহন রায়ের নামেই তিনি প্রকাশ করেন পুস্তিকাটি। কারণ বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন ঃ

> In closing this address, allow me to assume the name of one of the most enlightened and benevolent of the human

race now living, though not a whiteman, Rammohun Roy.[২১]

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন রায় যে পরিশ্রম করেছিলেন, সেটা জেরোমি বেন্থামের মতো বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ পণ্ডিতও খুব ভালভাবে জানতেন। বেন্থাম তাঁর "illustrious friend" রামমোহন রায়কে সম্বোধন করেছিলেন, তার থেকে এটা খুব সহজেই বোঝা যায় :

INTENSELY ADMIRED AND DEARLY
BELOVED COLLABORATOR IN THE
SERVICE OF MANKIND ![২২]

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা

রামমোহন রায় কেবল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা বা পরিশ্রম করেননি। নিজের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমস্যাটি তাঁর চিন্তায় ছিল বলেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এত গুরুত্ব পেয়েছিল তাঁর কাছে। বস্তুত তাঁর নিজের দেশের বারবার পরাধীন হয়ে যাওয়ার সমস্যাও তাঁকে ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি দর্শন, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান এই সমস্ত কিছুর অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান থেকে তিনি বিশ্বাসও করতেন যে ভারতের অর্থনীতি সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদিতে যদি সময়ের দাবি অনুসারে যথোপযুক্ত সংস্কার, পরিবর্তন বা উন্নয়ন না আনা যায়, তাহলে তার জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলেও সেটা রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি সমাজজীবনে যে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলির একান্তই প্রয়োজন, সেগুলির ভোগ-ব্যবহার বা প্রয়োগ করতেও তারা ব্যর্থ হবে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্নভাবে। হিন্দু ধর্মপালনের ব্যাপারে লিখিত তাঁর একটি পত্রে সুস্পষ্ট হয়েছে এই অভিমত ঃ

> ...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise... It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort ...[২৩]

এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একদিকে তিনি অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংস্কার, পরিবর্তন বা উন্নয়নসাধনের জন্য চিন্তা-ভাবনা এবং আন্দোলন করেছেন। অন্যদিকে তিনি রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এবং রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপকে তিনি কোনও প্রকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি

করে পরিচালিত করেননি, বা করতে পারেননি। তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

যে জাতিটি নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য তার নিজের সমস্ত অধিকার আছে বলে এবং তার জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ, তার বিধি-প্রণালীকে ধ্বংস, তার অভ্যাস ও আচার-ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন, তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন এবং তার অধিকারসমূহ সংক্ষিপ্ত করার কোনও অধিকার অন্য কোনও জাতির নেই বলে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, সেই জাতিটির আশা, আকাঙ্খা এবং প্রয়োজন থেকেই উৎপত্তি হয় জাতীয়তাবাদের।[২৪] তাই কোনও একটি জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির পূর্বে তাদের একটি জাতিতে রূপান্তরিত হওয়া আবশ্যক। বাংলায় যে সমস্ত নৃগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, তারা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পূর্বেই একটি অভিন্ন জনগণে, বাঙালি জনগণে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পূর্বেই এই বাঙালি জনগণ একটি অভিন্ন জাতিতে, বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেজন্যই বাংলায় একটি জাতীয়তাবাদ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। সকল সময় খুব সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখতে না পেলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বাঙালির এই জাতীয়তাবাদই বাঙালিকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে অসংখ্য ব্যাপারে আলাদা, পৃথক বা স্বতন্ত্র করে গঠন করেছে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে বাংলার এই জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে, সেগুলিকে দেখা যায় বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থা, ভূ-প্রকৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, রন্ধনপ্রণালী, সামাজিক নিয়মপদ্ধতি, আমোদ, প্রমোদ, স্বভাবচরিত্র, আচার-আচরণ, রীতি, নীতি, অভ্যাস ও প্রথা, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, পালা-পার্বণ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে। রামমোহন রায় এইসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবেই অবহিত ছিলেন। বস্তুত এইসব বৈশিষ্ট্যই তাঁকে দিয়েছিল সেই মজবুত ভিত্তি যার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কয়েকটি রায়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করার ফলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত আইনের যেগুলি বাংলার আইনের সঙ্গে সংগতি বা সামঞ্জস্য রক্ষার পরিবর্তে বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা স্থাপন করে, সেগুলি বাংলায় অনুসৃত বা বলবৎ হতে পারে না এবং জীমূতবাহন কর্তৃক ঘোষিত এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, রঘুনন্দন স্মার্ত্য ভট্টাচার্য এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনকে বাংলায় প্রয়োগ বা বলবৎ করার ব্যাপারে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা সত্ত্বেও তিনি যখন তাঁর স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করলেন, তখন তিনি বাংলার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণ ও ফলাফলের উপর কোনও গুরুত্ব দেননি। বাঙালির বা ভারতের অন্য কারও জাতীয়তাবাদের স্থান ছিল না তাঁর কাছে। সে জন্যই তাঁর ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত অভিমতে আমরা দেখতে পাইনি সে সব ত্রুটি, দোষ, জাতিদণ্ড বা অন্য জাতিবিদ্বেষ, যেগুলি জাতীয়তাবাদের সহজাত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা থেকে সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁর ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত অভিমতে ছিল উদারতা, সর্বজনীনতা এবং বিশ্বমানবতা। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এবং তার সঙ্গে জড়িত কার্যকলাপ থেকে যে সব অধিকার পাওয়া যায়, সেগুলির দ্বারা পুষ্ট বা পূর্ণ হতেও পারেনি তাঁর অভিমত। বেদ, উপনিষদ,

কারণ নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সত্ত্বেও ইউরোপের সকল মানুষ রূপান্তরিত হয়নি একটি জাতিতে। ইংরেজ রাজত্বের অনেক পূর্বেই ভারতের অধিবাসীগণ রূপান্তরিত হয়েছিল বাঙালী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী ইত্যাদি জাতিতে। এ সব জাতির মধ্যে কোনও প্রকার ঐক্যবোধ ছিল না। এমনকি বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছিল না ঐক্যের কোনও ধারণা।[২৭] ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ভারতীয় জাতি বলে কিছুই ছিল না। ছিল না কোনও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠীরা বাঙালী ও রাজপুতদের উপরে যে অত্যাচার করেছিল, ইউরোপের কোনও জাতিই সে রকম কিছু করেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষের কারোর প্রতি কারোর কোনও সহানুভূতি ছিল না। বিশপ বেহার লিখেছেন যে হিন্দুস্থান বা উত্তরভারতের মানুষের চোখে বাঙালীরা ইংরেজদের চেয়ে কম বিদেশী নয় বলেই গণ্য হত। ভারতের জনসাধারণ নিজেদের ভারতীয় হলে নয়, বাঙালি, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী বা মারাঠী বলেই মনে করতেন।[২৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কি এই অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল? ১৯০১ সনে বাল গঙ্গাধর তিলক লিখেছিলেন ঃ

> Just as Panini for some particular reason brought under one grammatical rule (sutra) the phrase dog and youngman and Indra, so too, it was only by accident within the mantle (satra) of the British rule that the Hindus, Moslems, Sikhs, Parsis, Bengalees, Madrasis, etc., all these people who once had different nationalities have been brought together. Therefore, it is wrong to suppose from this that their nationality has become one.[২৯]

একটির পরে একটি অভারতীয় জাতি বা ট্রাইব কর্তৃক পরাজিত শাসিত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অধিকার ব্যতীত বাঁচতে অভ্যস্ত ভারতের জনগণ তখন মনেই করত না যে ইংরেজরা তাদের দেশ দখল করে কোনও অপরাধ করেছে। সে জন্যই ইংরেজদের তারা খুব একটা শত্রু বলে ভাবত না। বরং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেই ছিল তারা। রামমোহন রায় যে অনুসন্ধান করেছিলেন, তাতে তিনি এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও ইংরেজ সরকার ভারতের জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না।

রামমোহন রায়ই প্রথম আধুনিক ভারতীয়, যিনি ভারত যে একটির পরে একটি বিদেশি আক্রমণকারীর হাতে পরাজিত হয়েছিল, সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছিলেন সমাজবিজ্ঞানীর মতো। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বিদেশির কাছে পরাজিত হয়ে স্বাধীনতা হারাবার পেছনে ছিল অনেক কারণ। এই কারণগুলিতে দেখা যায় তাঁর অনুসন্ধানের ব্যাপকতা এবং গভীরতা ঃ-

১। মুসলিম জাতি সমূহের আক্রমণের অনেক পূর্বে সাংবিধানিক সরকারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত স্বৈরতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির হাতে রাজ্য শাসনের এবং আইন প্রণয়নের সমস্ত

ক্ষমতা হয়েছিল কেন্দ্রীভূত। এই স্বৈরতন্ত্রী সরকারগুলি রাজ্যশাসনের নামে অত্যাচার চালিয়েছিল। তাই প্রজাসাধারণ তাদের এই শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণাই করত।[৩০]

২। সমস্ত ভারত বিভক্ত ছিল বা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল অগণিত রাজ্যে, উপরাজ্যে। এই রাজ্য-উপরাজ্যগুলি অধীনস্ত ছিল সেইসব ক্ষুদ্র, পৃথক এবং স্বাধীন রাজাদের যারা প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু।[৩১]

৩। ভারতের ছোট-বড় সকল রাজার মধ্যে ছিল মতানৈক্য কলহ এবং বিবাদ। কাপুরুষোচিত কর্মের জন্যও তারা সকলেই ছিল কুখ্যাত। ফলে জনসাধারণ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪। ইউরোপে যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলে বা অস্ত্রশস্ত্রে যে বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে প্রাচ্যে যে অজ্ঞতা বিরাজ করত, সেটাও ছিল তাদের দুর্বলতার একটি কারণ।[৩২]

৫। দেশপ্রেমহীনতা বা দেশপ্রেমের অনুপস্থিতি। ভারতের বহু শাসককে পরাজিত করবার জন্য বিদেশীরা ভারতীয়দের নিযুক্ত করেছিল। বাঙলা এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে দখল করার জন্য ইংরেজ কোম্পানী যে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়েছিল, তাতে প্রথম থেকেই ছিল শুধু উত্তর ভারতীয়রাই নয়, দক্ষিণ ভারতীয়রাও। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রামমোহন রায় মনে করতেন ভারতে দেশপ্রেমের বিকাশ হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে ভারত হলো "a country into which the notion of patriotism has never made its way."[৩৩]

৬। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয়দের যে অধিকার (excess) ছিল, সেটাও তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সহনশীলে পরিণত করেছিল।

৭। পানাহারের প্রয়োজনেও ভারতীয়রা পশুহত্যা থেকে বিরত থাকতো। ফলে তাদের দৈহিক শক্তি ও উৎসাহ এবং মানসিক তেজ ও সাহস প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৩৪]

৮। হিন্দুদের অনুসৃত ধর্মীয়-ব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৯। অসংখ্য ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, পবিত্রতা এবং শুদ্ধিসংক্রান্ত বিধানগুলি তাদের প্রায় সকল প্রকার কঠিন প্রকল্পের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত করে দিয়েছিল।

১০। যে জাতব্যবস্থা ভারতীয়দের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ ও উপবিভাগের প্রবর্তন করেছিল, সেটা তাদের দেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করেছিল। তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের প্রত্যেকটি গাঁথুনীকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল।[৩৫]

ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্বে লিখিত একটি পত্রে রামমোহন রায় তাঁরা আত্মচরিতের যে খসড়া (sketch) দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর কৈশোরে এবং তারুণ্যে ভারতের ইংরেজ শাসনের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ইংরেজ শাসন যে ভারতের ঘাড়ে আরেকটি বিদেশী জোয়াল, সেটা তিনি খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।[৩৬] ১৮২৯ সনে ফরাসি বিজ্ঞানী ভিক্টর জ্যাকুয়েমোন্ট কলকাতায় এসে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রামমোহন রায় জ্যাকুয়েমোন্টকে তাঁর তারুণ্যের কথাও

বলেছিলেন। ১৮৪১ সনে প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফরাসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে জ্যাকুয়েমোন্ট সে কথার উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন যে রামমোহন রায় তাঁকে বলেছিলেন ঃ

> Formerly, when he was a youngman, ...this Europe, the mistress of native land; was odious to him; in the blind patriotism of youth, he detested the English and all that came from them.[৩৭]

তারুণ্যের দিনগুলিকে অনেক পেছনে ফেলে তিনি যখন ৪৭ বৎসরের প্রৌঢ়, তখনও তাঁর ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ১৮২১ সনে তিনি লিখেছেন ঃ

> In Bengal, where the English are the sole rulers...the mere name of an Englishman is sufficient to frighten people.[৩৮]

তিনি জানতেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে জনসাধারণের কোনও প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। ইংরেজ শাসনে ছিল বহু অবৈধ এবং দমনমূলক ব্যবস্থা, যেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাদের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।[৩৯] রামমোহন রায় খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের সুযোগ গ্রহণ করে খ্রিস্টান মিশনারিগণ শুধু ভারতীয়দের ধর্ম এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করত না। একদিকে তারা ভারতীয়দের অপব্যবহার এবং অপমানিত করতো। অন্যদিকে কিছু পার্থিব সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে তাদের নিজেদের ধর্ম ছাড়িয়ে খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করতো।[৪০] তারা ভারতীয়দের যেসব নগণ্য কর্মে নিযুক্ত করতো, সেগুলি ছিল প্রকৃত অর্থেই অপমানজনক।[৪১]

রামমোহন রায় হিসেব করেই দেখিয়েছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ব্রিটিশ সরকারের এবং জমিদারদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা হয়েছে খুব শোচনীয়, "very miserable." তাদের কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করা হয়, সেটা ছিল ভয়ঙ্করভাবে বেশি, "a very heavy demand upon the cultivators." শুধু তাই নয় : ... they are placed at the mercy of the Zaminders' avarice and ambition.

তাছাড়া ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করার সময় ইংরেজ সরকার যে গরীব কৃষকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র জমিদারদের প্রশ্রয় দিতো এবং তাদের বক্তব্যকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতো, রামমোহন সেই অভিযোগও করেছিলেন বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতেই।[৪২]

রামমোহন রায়ই প্রথম ভারতীয় যিনি আমাদের দেশের কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত বক্তব্য পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত।

বাঙলাদেশের সম্পদরাশিকে ইংরেজরা তাদের দেশে এবং অন্যান্য উপনিবেশে পাঠিয়ে দিয়ে বাঙলাদেশের মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল, রামমোহন তার বিরুদ্ধেও সঙ্কলিত করেছিলেন তাঁর লেখনী।[৪৩] পরবর্তীকালে এই বিষয়টি ভারতের অর্থনীতি আলোচনায় খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি যে সব পরিসংখ্যানের ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলির সাহায্যও নিয়েছিলেন পরবর্তীকালের বহু অর্থনীতিবিদ।

ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফলের উপর

কার্ল মার্কসের রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ার অনেক পূর্বেই রামমোহন ভারতে ইংরেজ শাসনের দুটি বিরোধী ভূমিকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনে ভারতের যে সমস্ত ক্ষতি হয়েছিল, সেগুলি ইংল্যাণ্ড ভারতে যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করছিল, তার অনিবার্য ফল। তা সত্ত্বেও ইংরেজরা যে বাধ্য হয়ে তাদের স্বার্থেই ভারতে একটি নবসৃজনাত্মক ভূমিকাও পালন করছিল, রামমোহন সেই সত্যটিও আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে ইংরেজরা ভারতে এই নবসৃজনাত্মক ভূমিকা পালন করছিল একাধিকভাবে।[৪৪] ইংরেজ সরকার ভারতের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগেই, বিশেষত রাজস্ব এবং বিচার বিভাগে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে।[৪৫] সামাজিক এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ক্রমশ উন্নত করবার জন্য উদার এবং বিচক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাদের রাজত্বে স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তারা নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে।[৪৬] ইংরেজরাও আমাদের দেশে প্রবর্তন করেছে মুদ্রণ কৌশল। ভারতীয়রা সক্ষম হয়েছে শুধু নিজেদের ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতেই নয়, নিজেদের মধ্যে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করে বহু জনহিতকর কাজে এগিয়ে এসেছে তারা।[৪৭]

রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন যে উল্লিখিত কার্যকলাপের ফল নিশ্চিতভাবেই ভারতীয়দের সেইসব অশুভশক্তি, দুর্বলতা, হীনতা, অজ্ঞতা, চিন্তা ও দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, ভয়-কীর্তি এবং সীমাবদ্ধতাকে পদদলিত করতে সাহায্য করবে যেগুলি তাদের স্বাধীনতা হারাতে এবং বিদেশী শত্রুর পদানত হতে বাধ্য করেছিল বারবার।[৪৮] সে জন্যই তারুণ্যের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রৌঢ় রামমোহনের মন থেকে তিরোহিত না হলেও, ইংরেজ সরকারের নবসৃজনাত্মক ভূমিকা সেটাকে তুলনামূলকভাবে একটু গুরুত্বহীন করে দিয়েছিল। ভারত যে বারবার বিদেশির কাছে তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, সে প্রসঙ্গেই রামমোহন জ্যাকুয়েমোন্টকে বলেছিলেন ঃ

> India requires many more years of English domination so that she may not have many things to lose while she is reclaiming her political independence. [৪৯]

তাই মনে হয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন যথার্থই নির্ভুল ছিলেন, যখন তিনি লিখেছিলেন যে ঃ

> ...Rammohun looked upon the British domination of India as a period of political tutelage.[৫০]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা যায়। বেন্থামের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে রামমোহন রায় অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জনসাধারণ, জনসমষ্টির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। তাই বেন্থামের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও দেখা যায় তাঁকে। ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ কৃষক। তাঁরা শুধু দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন না, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের অসহায় শিকারও ছিলেন। রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষের উন্নতি বা সমৃদ্ধি না হলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না, এলেও তা স্থায়ী হতে পারবে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে ভারতের এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষের সমৃদ্ধিকে

সুনিশ্চিত করার কোনও ক্ষমতা যখন ভারতীয়দের মধ্যে ছিল না, তখন তাদের ইংরেজ রাজত্ব থেকে এই বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করার জন্য সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করতেন রামমোহন। জ্যাকুয়েমোন্ট লিখেছেন যে রামমোহন রায় তাঁকে বলেছিলেন ঃ

> ...The object, the goal, so to say, of society is to secure the happiness of the greater possible number, and when, left to itself, a nation cannot attain this object, when it does not contain within itself the principles of future progress, it is better for it that it should be guided by the example and even by the authority of a conquiring people more civilized.[৫১]

রামমোহন সর্বদাই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের জনসাধারণ একদিন অবশ্যই পদদলিত করতে পারবে সেইসব অশুভ শক্তি বা শৃঙ্খল যেগুলির জন্য তারা বিদেশির কাছে পদানত হয়েছে বারবার। আর যে দিন, যে মুহূর্তে তারা সেই অশুভ শক্তি বা শৃঙ্খলগুলিকে পদদলিত করতে পারবে, সে দিন, সে মুহূর্তে সমাপ্ত হবে ভারতে ইংল্যাণ্ডের সৃজনাত্মক ভূমিকা। ভারতীয় জনগণ ইংল্যাণ্ডের অধীনে থাকতে অস্বীকার করবে বীরের মতো, কার্যকরভাবে ঃ

> Supposing that some 100 years hence the native character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society ?[৫২]

রাজনৈতিক অধিকার

রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত সামর্থ্যের প্রয়োজন, সেইসব সামর্থ্য অর্জন করতে তাঁর দেশবাসীর যতদিন বা যে সময় লাগবে, ততদিন বা সেই সময় পর্যন্ত রামমোহন বৃটিশ সরকারের হাতে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ছেড়ে দিতে সম্মত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবাসী কিন্তু কখনোই সেই সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে না যদি তাদের ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে পরিচিত হতে দেওয়া না হয় যেগুলি প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের মানুষ ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে। রাজনৈতিক অধিকার বলতে রামমোহন যা বোঝাতেন, তার মধ্যে ছিল, দেশের শাসক স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তায় পরিণত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার।[৫৩] রামমোহন দেখেছিলেন যে পরাধীনতা সত্ত্বেও কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার ভোগ বা ব্যবহার করার সামর্থ্য ছিল তাঁর দেশবাসীর। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত সামর্থ্যের প্রয়োজন, সেগুলি অর্জন করার জন্যই ভারতবাসীকে এই রাজনৈতিক অধিকারগুলি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।[৫৪] রামমোহন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাতে ছিল দুটি প্রণালী। প্রথম প্রণালী

দিয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর মধ্যে যে উচ্চাদর্শ প্রচার করেছিলেন, তার সারমর্ম এই ঃ

অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনস্থ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়।[৫৫]

তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী নয়, সেটা জাতীয় কণ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি স্পষ্ট করে দেখালেন যে ইংল্যান্ড যে প্রভূত উন্নতি করেছে, তার মূলে ছিল ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র বা সাংবিধানিক সরকার। ইংল্যান্ডের যে রাজারা জনগণের অধিকার পদদলিত করেছিল, ইংরেজ জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিল। সেজন্যই তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাংবিধানিক সরকার।[৫৬] রামমোহনের মতে প্রাচীন ভারতের জনসাধারণও তাদের এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে প্রভূত উন্নতি করতে পেরেছিল প্রাচীন ভারত। রামমোহন রায় পরশুরামের ক্ষত্রিয় শাসক হত্যার যে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন, সেটা বস্তুবাদী, বিজ্ঞানসম্মত।

> At an early age of civilization, when ... the second tribe hearing adopted arbitrary and despotic practices, the others revolted against them; and under the personal command of ... Parasuram, defeated the Royalists... and put cruelly to death all the male members of that tribe ... The consequence was, that India enjoyed peace and harmony for a great many centuries.[৫৭]

তাঁর দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে তিনি আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে অর্জন করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সিংহবিক্রমে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তিনি বুঝতে পারেন যে, সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত তাঁর সংগ্রাম সফল হবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তখন বিভক্ত ছিল অসংখ্য পুঞ্জে-উপপুঞ্জে। রামমোহন এমন একটি কর্মধারা তুলে ধরেন যে জনগণ সেটাকে তাদের নিজেদের বলেই গ্রহণ করলেন। শুধুমাত্র প্রগতিশীল এবং উদারপন্থীরা নয়, যে সকল রক্ষণশীল তাঁর সমাজ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের একাংশও এগিয়ে এসে সমর্থন করলেন তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনকে। এমনকি যে মুসলমানরা এতকাল জনস্বার্থ সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন, তাঁদের একাংশও এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পাশে। উল্লিখিত তিনটি অংশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার পরেও রামমোহন বুঝতে পারেন যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাঁদের ফ্রন্টের "... সে শক্তি ছিল না একেবারে।" রামমোহন বুঝতে পারেন যে বাংলাদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের একটি অংশের সাহায্য পেলে তাদের সংগ্রামের সুবিধা হবে। তখন বাংলাদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন স্বাধীন বণিক, ঔপনিবেশিক, এজেন্সি হাউসের মালিক, নীলকর প্রভৃতি। তাঁরা প্রকাশ্যেই কোম্পানী সরকারের অনেক নীতি ও কার্যের বিরোধিতা করতেন। সেজন্য তাদের কোম্পানী সরকারের শত্রু বলেই গণ্য করা হতো। তাঁদের সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে অনেক সাহায্য এবং সমর্থন

দিয়েছিলেন রামমোহন এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ। রামমোহনের চেষ্টার ফলে বিনিময়ে তাঁরাও এগিয়ে এসে সাহায্য ও সমর্থন করলেন রামমোহনের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে।[৫৮]

যে রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভারতীয়দের পাওয়া উচিত বলে মনে করতেন রামমোহন, সেগুলির মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই দুটি ঃ

১। **সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সাম্য**। এতে ছিল সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, তাকে বিলুপ্ত করার দাবি। বৃটিশের রাজদণ্ডতলে ভারতীয়রা যে সমস্ত রাজনৈতিক উচ্চপদ এবং ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সুবিধা বিশেষ হারিয়ে ফেলেছিল সম্পূর্ণভাবে, সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয়দের সরকারের নতুন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করবার দাবি করা হোল।[৫৯]

২। **আইনের চোখে সাম্য**। আইনের চোখে সাম্য বা ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি অনেক পুরনো। কিন্তু ১৮২৬ সনে খৃস্টান এবং অ-খৃস্টানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক শর্ত যুক্ত করে জুরি আইন পাশ করার পরেই এই দাবি রীতিমতো রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।[৬০]

রামমোহন রায়ের মতে কেবলমাত্র কোনও প্রকার বিশ্বাসের বা দায়িত্বের পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার জন্যই সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রণীত এই বৈষম্যের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে একটি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করাও ছিল এই বৈষম্যের উদ্দেশ্য। তিনি অভিযোগ করেন যে ইংরেজ সরকার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে

> the road to European privileges and distinctions and an equality with governing class can only be reached by a profession of the religion of the greater part of Europe.[৬১]

রামমোহন এই আইনের বৈষম্যমূলক শর্তসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁর এক ইউরোপীয় সহযোগী জে ক্রফোর্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় সংসদে তিনি দরখাস্ত পেশ করলেন। তাতে বলা হল যে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানরা '...from their superior acquiantance with the very peculiar habits, manners and prejudices of their countrymen were sure to prove most useful auxiliaries in the administration of justice...'

আপত্তির শর্তটিকে 'দুদিক থেকেই অনিষ্টকর এবং ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের পক্ষে অপমানজনক' বলে অভিহিত করে রামমোহন অভিযোগ করেন যে "এই আইনটি তাদের নিকৃষ্টতার ছাপ দিয়ে আইনের চোখে কলঙ্কিত করেছে।" তিনি দাবি করেন যে, "এই আইনটি যে ঘৃণাজনক এবং অবিবেচনাসূচক বৈষম্য করেছে, অবিলম্বে সেটাকে বাতিল করতেই হবে।[৬২]

রামমোহনের মুখপত্র **সংবাদ কৌমুদী**ও তাঁর ওই দরখাস্তের সমর্থনে লিখতে আরম্ভ করে। অভিযোগ করা হল : খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের জন্য ইংরেজ সরকার অন্যায্যভাবেই সাহায্য দিতে ইচ্ছুক। সে জন্যই তারা এই বৈষম্যের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা ভারতবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

> Missionaries and clergymen ... spent more than thirty years in disseminating their faith ... without being able to make a single true and sincere convert to christianity : but now the way is opened and many persons ... will take shelter under the Christian faith. When rulers ... use force or art to win over their subjects to their faith from that of their ancestors, who shall have the power to oppose? [৬৩]

স্বাধীন বণিকগণ ইংল্যান্ডে যে-সব পত্রিকা প্রকাশ করতেন, সেগুলিও এগিয়ে এলো রামমোহনের সমর্থনে। সেগুলিও লিখতে আরম্ভ করে তাঁর আন্দোলনের পক্ষে। ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরেও রামমোহন নানা পত্রিকা, পুস্তিকা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে এই আন্দোলন চালাতে থাকেন। ফলে পার্লামেন্টে যখন তার দরখাস্তটির আলোচনা হলো তখন অনেক সদস্যই তাঁর দাবি সমর্থন করলেন।[৬৪] বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হওয়ার পরেই চার্লস গ্র্যান্ট এই বৈষম্যমূলক শর্তটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য একটি নতুন বিল রচনা করেন। এর ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করল কোর্ট অব ডিরেকট্রস্। রামমোহনও কলম ধরেন তাদের বিরুদ্ধে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে নিকৃষ্টতা ও অনুপযুক্ততার অভিযোগ করা হয়, রামমোহনের বিচারে সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই ভিত্তিহীন। অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন যে প্রত্যেক সরকার —

> ... ought to treat the various classes of its subjects ... as one great family, without showing any invidious preference to any particular tribe or sect, but giving fair and equal encouragement to the worthy and intelligent under whatever denomination they may be found.

রামমোহন খুব জোরের সঙ্গেই বললেন যে এই নীতির কোনও প্রকার লঙ্ঘন হলেই সমাজের অনেক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বললেন যে, সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে অসন্তোষের উৎপত্তি হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি হয়েছে এই বৈষম্যমূলক আইন এবং তার দৈনন্দিন প্রয়োগের ফলে। [৬৫]

ভারতের খৃস্টান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় গ্র্যান্টের সংশোধিত জুরি এ্যাক্টের বিরোধিতা করলো। আইনটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য আবেদন করে তারা হাউস অব লর্ডস্-এ একটি দরখাস্ত পাঠাতেও ত্রুটি করল না। ভারত থেকে এই ধরনের একটি দরখাস্ত পেশ হওয়াতে রামমোহন খুবই ব্যথিত হলেন। তাঁর অতিশয় ভদ্র কিন্তু বাগ্মিতা এবং যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদে ইংল্যান্ডে যে ঝড় উঠেছিল সেটা স্বীকৃত হয়েছে ইতিহাসে। বস্তুত রামমোহনের বক্তব্য ও বক্তৃতায় প্রভাবিত হওয়ার ফলেই লর্ড এলেনবরা গ্র্যান্টের জুরি এ্যাক্টের বিরোধী দরখাস্তটিকে সমর্থন করেন নি।[৬৬]

১৮৩২ সনের ১৬ আগস্ট তারিখে পুরনো জুরি এ্যাক্টের বৈষম্যমূলক শর্তটিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে নতুন জুরি এ্যাক্ট আইনে পরিণত হলো। বাংলাদেশ থেকে অভিনন্দিত হলেন গ্র্যান্ট।[৬৭] কিন্তু কোর্টের ডিরেকটরগণ এবং ভারতের খৃস্টান এবং ইউরোপীয়রা গ্র্যান্টের

নিন্দা করে বললেন যে তিনি .... "তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই অনভিজ্ঞ আইন প্রণেতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন অবিমিশ্রিত কল্পনা-প্রবণ ব্যক্তি ... তাঁর দৃষ্টি রামমোহন রায়ের দ্বারা কুয়াশাচ্ছন্ন।" রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধেও তাঁরা অভিযোগ করে বললেন যে, "তাঁর তত্ত্বের প্রতি ভাবাবেগ বশতই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন সত্য এবং ন্যায়পরতাকে।"[৬৮]

স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলন জুরি এ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলনের অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে আন্দোলন শুধুমাত্র ভারতীয়রা শুরু বা পরিচালনা করেননি। ইউরোপীয় স্বাধীন বণিকেরা ছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁরা অবশ্য জুরি এ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলনকেও সমর্থন এবং সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেটা করেছিলেন বাইরে থেকেই। প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের জড়িত করেননি তাঁরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন ভারতীয়রাই রামমোহনের নেতৃত্বে। ১৮২৬ সনের জুরি আইন বিরোধী আন্দোলনই ছিল রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। বৃটিশ পার্লামেন্টে যে দরখাস্তটি পাঠানো হয়েছিল, তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন ২৪৪ জন কলকাতার নাগরিক। তাঁদের মধ্যে কেবল রামমোহন রায় এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, বিশ্বনাথ মতিলাল প্রমুখের মতো সুপরিচিত প্রগতিশীল সংস্কার-পন্থী ব্যক্তিরাই ছিলেন না। রসময় দত্ত, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো রামমোহন বিরোধী গোঁড়া ও রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও ছিলেন। আবার ২৪৪ জন স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন মাত্র ১২৭ জন, ১ জন পারসী বণিক রুস্তমজী কোয়াসজী। বাকি ১১৫ জন ছিলেন মুসলমান।[৬৯] জনসমষ্টির কোনও একটি বিশেষ অংশের প্রতিনিধিত্ব করেনি দরখাস্তটি। কলকাতা তথা বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এই দরখাস্তে। ধর্মীয় পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে হিন্দু এবং মুসলমানরা যে ইংরেজ সরকারের কু-মতলবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে সেটাই দেখিয়ে দিয়েছিল ১৮২৬ সনের জুরি আইনবিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনকারীগণ তখনই পরবর্তীকালের অসহযোগ আন্দোলনের বীজ বপন করলেন যখন তাঁরা তাঁদের উল্লিখিত দরখাস্তে ঘোষণা করলেন যে—

> ... if the disabilities imposed upon them by it be not removed... the result will be, that no Hindoo or Mohameddan inhabitant will willingly serve as a Juror in any capacity.[৭০]

নাগরিক অধিকারের আন্দোলন

নাগরিক অধিকার বলতে রামমোহন রায় যা বোঝাতেন, তাতে ছিল জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তিরক্ষা, স্বাধীনভাবে ধর্মগ্রহণ, পালন এবং প্রচার, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ইত্যাদির অধিকার।[৭১] বেন্থামের মতবাদের দ্বারা সুরঞ্জিত তাঁর ইতিহাসের জ্ঞান তাঁকে এটা বুঝিয়েছিল যে কর্তব্যই মানুষকে অধিকার প্রদান করে এবং রাষ্ট্র ব্যতীত কোনও অধিকার থাকতে পারে না। কর্তব্য, অধিকার এবং সরকার এই তিনটির মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে

আইন। আইনকে বলবৎ করে রাষ্ট্র। সেজন্যই রামমোহন উদ্দেশ্যমূলক (objective) এবং প্রক্রিয়ামূলক (subjective) এই দুটি আইনের সংস্কার সাধন করে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারসমূহকে সুরক্ষিত করতেই অগ্রসর হন।[৭২] তাঁর Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property ... প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩০ সনে। পুস্তিকাটির প্রকাশের তারিখ থেকে বোঝা যায় যে রামমোহন সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজের গবেষণা থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সেটা ১৮৩০ সনে ছিল প্রকৃত অর্থেই আধুনিক। কারণ তাতেই তিনি পরবর্তীকালে পরিপুষ্ট বিশ্লেষণবাদী (Analytical) এবং ঐতিহাসিকতাবাদী (Historical) এই দুটি চিন্তাধারার আসল সত্যকে অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঃ

> In every country, rules determining the rights of succession to, and alienation of property, first originated either in the conventional choice of the people, or in the discretion of the highest authority, secular or spiritual ; and those rules have been subsequently established by the common usages of the country, and confirmed by judicial proceedings.[৭৩]

আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের যে অভিমত পাওয়া গেল, তাতে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য কী ? তিনি আইনের সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করলেন। তাঁর মতে সমস্ত আইন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিধিসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটাই ঃ

সেটি হলো লোকশ্রেয়ঃ, জনসাধারণের মঙ্গল, মানবতার মঙ্গল, সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন মঙ্গল সাধন।[৭৪]

দেওয়ানী এবং ফৌজদারী এই দুটি আইনকেই লিপিবদ্ধ (Codify) করবার জন্য সরকারের কাছে একটা সুচিন্তিত প্রস্তাবও দিয়েছিলেন রামমোহন। তিনি দেখালেন যে মুসলিম শাসনের যুগে প্রবর্তিত মুসলিম ধর্মের ভিত্তিতে প্রণীত ফৌজদারী আইনই ভারতে প্রচলিত ছিল। ১৭৯৩ সনের পরে বৃটিশ সরকার যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি (Regulations) জারি করেছিলেন, সেগুলি মুসলিম আইনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। তার ফলে ভারতে একটি নতুন ধরনের আইনের উৎপত্তি হয়েছে বলা যায়। এই আইনের একদিকে যেমন রয়েছে মুসলিম আমলের পুরনো বিধান, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণবিধি। ইসলাম ধর্মীয় উপাদান দিয়ে গঠিত হয়েছিল পুরনো বিধান। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণবিধিগুলিও খৃস্টান ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব থেকে যথেষ্ট মুক্ত ছিল না।[৭৫] তা সত্ত্বেও আমাদের আইন বা আইন ব্যবস্থাকে হিন্দুচরিত্র দেওয়ার জন্য দাবি করেননি রামমোহন রায়। যথার্থ অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ রামমোহন সুস্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে তিনি যে ফৌজদারী আইনের লিপিবদ্ধ রূপের পক্ষপাতী সেটা হওয়া উচিত—

> ... simple in its principles, clear in its arguments, and precise in its definitions; so that it may be established as a standard or criminal justice itself, and not stand in need

of explanation by a reference to any other books of authority, either Mohammedan or Christian.[৭৬]

ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনকে লিপিবদ্ধ করবার জন্য রামমোহন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেটা বেন্‌থামের মতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে যে কথা শোনা যেত, সেটা সম্ভবত ভুল নয়। কিন্তু জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত প্রয়োজনে পার্থক্যবিহীন, এক এবং অভিন্ন বলে বেন্‌থামের যে সুনির্দিষ্ট অভিমত ছিল, রামমোহন কখনোই সেই মত গ্রহণ বা পোষণ করেননি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসম বিকাশ কিংবা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসম স্তরের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে নানা প্রকারের পার্থক্য রয়েছে, রামমোহন সে সম্বন্ধে ছিলেন যথেষ্ট অবহিত। এই পার্থক্যগুলি উপেক্ষণীয় নয় বলেই ছিল তার অভিমত। সকল দেশের মানুষের রাজনৈতিক এবং আইনগত জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নীতি প্রণয়নের সময় তাদের এই পার্থক্যগুলিকে বিবেচনা করা আবশ্যক বলেই ছিল তাঁর সুচিন্তিত প্রস্তাব। সেজন্য কল্পিত সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের ফৌজদারী আইন প্রণয়ন বা লিপিবদ্ধ করবার জন্য বেন্‌থামের যে নির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল, রামমোহন তা বাতিল করে ছিলেন।[৭৭] অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে তিনি বললেন ঃ

A Code of criminal law for India should be founded as far as possible on those principles which are common to and acknowledged by all different sects and tribes inhabiting the country.[৭৮] দেওয়ানী আইনকে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাবে যে সমস্ত নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত সেগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় :

> ... a code of civil law should be formed on similar principles to those already suggested for the criminal code... The law of inheritance should, of course, remain as at present with modificating peculiar to the different sects, until by the diffusion of intelligence the whole community may be prepared to adopt one uniform system.[৭৯]

দেওয়ানী আইনে অভিন্নতা স্থাপনের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন বুঝতে পারেন যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ট্রাইবের অনুসৃত এবং স্বীকৃত নীতি বা আদর্শগুলিকে অভিন্নতার স্বার্থে যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। সেজন্যই তিনি শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান বিস্তারের যে পর্যন্ত সমগ্র সমাজ একটি অভিন্ন আইন গ্রহণ করতে সম্মত না হয়, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বিচারব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন

রামমোহন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারেন যে বিচারব্যবস্থার পুরোপুরি সংস্কার না হলে, কোনো আইনের দ্বারাই জনসাধারণের কোনো মঙ্গল হবে না। তাই ভারতের জন্য

উত্তম আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্যও প্রস্তাব করলেন। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি দেখালেন যে ইংরেজ শাসনাধীন অঞ্চলগুলির বিশালত্ব অনুসারে আদালতের সংখ্যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ফলে–

> the poorer classes are in general unable to go and seek redress for any injury, particularly those who may be oppressed by their wealtheir neighbour possessing local influence.

আদালতের এই ঘাটতির জন্য বিচারের বিলম্ব হত। আর এই বিলম্বের ফলে যে বিচারের আসল উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়ে যেত, রামমোহন কেবল সেটাই দেখাননি। বিচারের ফল যে অন্যায়কারীদের উৎসাহিত করত এবং নিরপরাধী এবং নিপীড়িত মানুষগুলিকে নিরুৎসাহিত করত সমপরিমাণে, রামমোহন রায় সেদিকে তাঁর অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন ঃ

> By this state of things wrong-doers are encouraged and the innocent and oppressed in the same proportion discouraged, and often reduced to dispair.[৮০]

এইসব অনিষ্টতা দুর করবার জন্য তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেটা ছিল বাস্তবসম্মত।[৮১] বিচার-ব্যবস্থায় ভাষার প্রশ্নটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও বুঝতে পারেন রামমোহন। মুসলিম শাসনের সময় দেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল পারসী। স্বভাবতই আদালতের ভাষাও ছিল পারসী। ইংরেজরা তার কোনো পরিবর্তন না করে পারসী ভাষাকেই বলবৎ রাখলো। পারসী ভাষা আমাদের দেশের কারোর মাতৃভাষা নয়। রামমোহন বুঝতে পারেন যে এই রকম একটি ভাষায় অসুবিধা হয় সকল পক্ষেরই। অতএব পারসী ভাষাকে সরিয়ে দেওয়া সঠিক বলেই মনে করলেন তিনি। কিন্তু তার স্থান দখল করতে দেওয়া হবে কোন ভাষাকে? আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে বলে বিশ্বাস করতেন রামমোহন। সম্ভবত সেজন্যই তিনি ভেবেছিলেন যে আদালতে বাঙলার পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলিত হলে, সাধারণ বাঙালির কিছু অসুবিধা হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার যে অগ্রগতি হবে, সেটা ঐ অসুবিধাজনিত ক্ষতি পূরণ করতে পারবে। তাই প্রথমেই তিনি ইংরেজি ভাষাকে আদালতের ভাষা করার জন্যই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৮২] কিন্তু কিছুদিন পরে ইংল্যান্ডে থাকার সময় তাঁর এই মতের পরিবর্তন হয়েছিল। তা না হলে খোদ ইংল্যান্ডে বসেই তিনি কখনোই লিখতেন না ঃ

> The English in India should adopt Bengali as their mother tongue.

যে কারণে তিনি ব্যক্ত করলেন এই মত, সেটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে কেন তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছিল বাংলার পক্ষে ঃ

> Are not the English in India few in number ? Do not they boast how superior they are to us in everything, above all in freedom from prejudice; surely it is much easier for two or three thousand of them to adopt our language or character than to expect sixty millions of Natives, most of whom are so poor that they work hard all day at their

respective avocations, to give up that which they have used for centuries and accept a new one.[৮৩]

রামমোহন ছিলেন বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার একান্ত সমর্থক। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিচারব্যবস্থা যাতে কোনো শর্তের উপরে উঠতে বা ব্যবস্থাপক সভার উপরে কর্তৃত্ব করতে না পারে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব সতর্ক। তাঁর বহুমুখী জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে বিচারকেরা সমাজেরই মানুষ; তাঁদের কেউই অতিমানব নয়। তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন এমন অনেক, যাঁরা–

are not so well-gifted ... not equal to the wishes of their employers, not calculated to give general satisfaction.[৮৪]

সেজন্যই দুর্নীতির উদ্ভব হয়েছে। এই দুর্নীতি নির্মূল করবার জন্য তিনি সরকারকে উর্ধ্বতন বিচারকবর্গের ভূমিকা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন না। তার পরিবর্তে তিনি সরকারকে জনমতের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত করতেই পরামর্শ দিলেন। ১৮৩১ সনে তাঁর এই পরামর্শ যে প্রকৃত অর্থেই বৈপ্লবিক ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে আদালত অবমাননার ব্যাপারে যে আইন রয়েছে, সেটার দরুন এখনও বিচারকবর্গ তাদের কোনও আদেশ বা সিদ্ধান্তের জন্য দেশের নাগরিকদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়। অথচ এই নাগরিকেরাই ক্ষমতার গদিতে বসিয়েছেন সেইসব ব্যক্তিকে যাঁরা তাঁদের দিয়েছেন নিয়োগপত্র। রামমোহন রায় মনে করতেন যে এই জনমতের তত্ত্বাবধানের দ্বারাই সম্ভব হবে–

to watch whether the judges attend their courts once a day on once a week or whether they attend to business six hours or one hour a day, or their mode of treating the parties, the witnesses, the .. pleaders or law officers, and others attending the courts – as well as the principles on which they conduct their proceedings and regulate their decisions...[৮৫]

রামমোহন স্বীকার করতেন যে বিচারকের কাছে বিচার করার জন্য যে সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়া হয়, সেইসব মোকদ্দমার সম্বন্ধে তিনি যা বুঝবেন, সেইভাবে স্থির করবার বা রায় দেওয়ার স্বাধীনতা তাঁর অবশ্যই আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা শর্তহীন বা সমস্ত কিছুর উপরে নয়। একটি নির্দিষ্ট নীতির চারি সীমানার ভেতরেই রাখতে হবে এই স্বাধীনতাকে। কেননা, তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন,

..a judge... is required to observe strict adherence to the established law, where its language is clear.[৮৬]

রামমোহন রায় দেখিয়েছিলেন যে স্মরণাতীত কাল থেকেই আমাদের দেশে জুরি প্রথা প্রচলিত ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বা পঞ্চায়েত নামে। তবে ইউরোপের জুরি ব্যবস্থার সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল অনেক ব্যাপারে। ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে যে বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করে, তাতেও আমাদের জুরিব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল হয়নি। কিন্তু ব্যবস্থাটিকে তারা একটি আলাদা ভূমিতে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছে।

ইদানীং আমাদের দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার দরুন গ্রামাঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষুব্ধ হয়েছে। তবে পঞ্চায়েতের হাতে এখনও কোনও প্রকার বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু রামমোহন রায় দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশে এককালে বিচারের ক্ষমতাও ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। রামমোহন কেবল পঞ্চায়েতের হাতে বিচারের ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষেই ছিলেন না; পঞ্চায়েত যাতে সঠিকভাবেই বিচার করতে পারে, সেই মর্মে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্যই তিনি সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। পঞ্চায়েতী বিচার-ব্যবস্থা আমাদের দেশের উৎকোচ নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, জালিয়াতি করার মতো জঘন্য দুর্নীতিকে বাধা দিতে পারবে বলেই মনে করতেন রামমোহন।[৮৭]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, বিচারবিভাগীয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পরিবর্তন-সংক্রান্ত সকল সমস্যাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জন্ অ্যাডাম্ অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পরে ১৮২৩ সনে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন এবং কোনও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সংবাদপত্রের প্রকাশনাকেই অসম্ভব করেছিলেন। রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীরা এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন পেশ করলেন। বিচারপতি তাদের আবেদন খারিজ করে দিলেন এই বলে ঃ

> If we are to have a free constitution, which we have not, let free press follow it, not precede it.[৮৯]

রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীরা ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকটে একটি আপীল পাঠালেন। রামমোহন রায় লিখিত এই আপীলকে ভারতীয় ইতিহাসের অ্যারিওপ্যাজিটিকা বলা হয়েছে। এই আপীলে রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছিলেন, অনেক বৎসর পরে সেগুলিকে দেখা যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের পুস্তকে।[৯০] কিন্তু তাতে কোনও সুফল হয়নি। প্রিভি কাউন্সিল বাতিল করে দিল তাদের আপীল। অত্যন্ত মর্যাদা-ব্যঞ্জকভাবেই রামমোহন রায় এর প্রতিবাদ করলেন। তিনি তাঁর পারসি পত্রিকা মিরাত-উল-আখবরের প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন। পারসি কবি হাফিজের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে বললেন ঃ

> The respects which is purchased with a hundred drops of heart's blood, do not thou, in the hope of a favour, commit to the mercy of a porter.[৯১]

বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে রামমোহন রায়ের চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপের মধ্যে কিছু অসংগতি ও সীমাবদ্ধতা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই অসংগতি ও সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে তাঁর বহু চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপের যে ইতিবাচক এবং বৈপ্লবিক দিক রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা ঠিক নয়। কারণ এ কথা কখনোই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়েছিল ১৭৭০ সনে, পলাশীর যুদ্ধের ১৭ বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩৩ সনে, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশিত হওয়ার ১৫ বৎসর পূর্বে। তাঁর ৫৯ বৎসরের জীবনকালে আমাদের দেশ, রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে—

...having lost its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, in object slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition, and ceased to exercise our humanity.[৯২]

তথ্যপঞ্জি ঃ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৩৫২-৫৪।

২। P.C.Ganguly "Raja Rammohan Roy" in A.C.Gupta, ed., Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1958. p. 14.

৩। Durga Prasad Mazumder, Dimensions of Political Culture in Bengal,Calcutta, 1993, p.9

৪। উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৭

৫। Karl Mannheim, Ideology and Utopea, London, 1933, p.9.

৬। H.J.S. Cotton, New India : Or India in Transition, London, 1905, p. 15.

৭। J.N.Sarkar, ed., The History of Bengal, Muslim Period, Dacca 1946, Reprint Patna 1973, p. 498

৮। Roberto Michels, "Intellectual" in E.R.A. Seligman, ed., Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. VIII, New York, 1935, pp. 118-124.

৯। B.B.Majumdar, "Rammohun, The Father of Modern Political Movements in India" in *Commemoration Volume,* Calcutta, 1933, p. 306

১০। উ. গ্র. পৃ. ৩০৩

১১। William Adam, "The Raja : A Lover of Freedom" in *Commemoration Volume,* p. 68.

১২। R.C. Majumdar, *Renaiscent India,* Calcutta, 1976, p. 245.

১৩। *Commemeration Volume,* pp. 116-118.

১৪। D.P. Mazumdar, op. cit., p. 202

১৫। *Selected works of Raja Rammohan Roy,* Govt. of India, New Delhi, 1977, p. 292

১৬। D.K.Biswas & P.C. Ganguly, eds., *Collet Raja Rammohun Roy,* Calcutta, 1988, p. 164.

১৭। উ. গ্র. পৃপৃ, ২৯২, ২৯৪

১৮। Rammohun Roy's *letter* dated 27 April, 1832 in B.N. Dasgupta, *Rammohun Roy, The Last Phase,* Calcutta, 1982, p.144.

১৯। *Selected Works of Raja Rammohun Roy* etc., op. cit. p. 294

২০। B.N.Dasgupta, *The Life & Times of Rajah Rammohun Roy,* New Delhi, 1980, pp. 221-23.

২২। Bentham's *letter to* Rammohan Roy in D.K.Biswas to P.C. Ganguly. eds., op. cit., pp. 452-57

২৩। *Selected Works of Raja Rammohun,* etc. op cit. p. 296

২৪। J.V. Stalin, *Marxism and National* Questions, Calcutta, 1971, p. 31

২৫। D.P.Mazumder, op. cit. pp. 206-08

২৬। *Memorial to the Supreme Court* under the signatures of C.C.Tagore, D.N.Tagore, Rammohan Roy, etc. in J.C.Ghose, ed. *English Works of Raja Rammohun Roy,* Vol. II, Calcutta. 1901, p. 280.

২৭। B.B.Majumdar, *Militant Nationalism is India,* Calcutta, 1968, p. 2. বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, "ভারত কলঙ্ক — ভারতবর্ষ পরাধীন কেন", বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, ১৩৮০, পৃ. ২৪০

২৮। R.C.Majumdar, ed., *History and Culture of Indian People,* Vol. X, Part II, Bombay pp. 28, 29

২৯। B.G.Tilak, *Kesari,* 23 April, 1901.

৩০। J.C.Ghose, *op.cit.,* pp. 195-96.

৩১। উ. গ্র. পৃ. ৩

৩২। উ. গ্র. পৃ. ৬

৩৩। উ. গ্র. পৃ. ৫

৩৪। H.C. Sarkar, ed., *English Works of Raja Rammohun Roy,* Vol I, Calcutta 1928, p. 160.

৩৫। *Selected Works of Raja Rammohun Roy,* op. cit., p. 296.

৩৬। Mary Carpenter, *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy,* Calcutta 1976. p. 15.

৩৭। Victor Jacquemunt, "A Portrait of Rajah Rammohun Roy" in Modern Review, (Translated by N.C.Choudhury) p. 689.

৩৮। H.C.Sarkar, ed., *op. cit.* pp. 160.

৩৯। *Selected Works of Raja Rammohun Roy.,* etc. op. cit. p. 297.

৪০। H.C.Sarkar ed. *op. cit.* pp. 159-160.

৪১। J.C.Ghose, ed., op. cit. p. 97

৪২। উ. গ্র. পৃপৃ ৬৪-৬৬, ৬৮-৬৯, ৭৯, ৮১, ৮২-৮৪, ৮৫, ১০০-০৪

৪৩। উ. গ্র. পৃপৃ ৭৭, ১০৫-০৯

৪৪। Rammohun Roy's letter to P.C. Tagore as published in *India Gazette,* 22 January, 1833.

৪৫। J.C.Ghoshe, op. cit. p. 8

৪৬। উ. গ্র. পৃ. ২৮১

৪৭। উ. গ্র. পৃ. ২৮২

৪৮। Rammohun's letter to J. Crawford dated 18 August, 1828 in *Selected Works of Rajah Rammohun Roy.* pp. 297-298

৪৯। Victor Jacquemont, op. cit. p 290

৫০। *Commemoration volume,* op. cit. p.

৫১। Victor Jacquemont, op. cit., p. 292

৫২। *Selected Works.....* op. cit. p. 297

৫৩। *Calcutta Journal,* 29 April, 1822

৫৪। B.B.Majumdar, *History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda, Calcutta, 1967, p. 26*

৫৫। *Calcutta Journal,* 20 December 1821

৫৬। *Calcuta Journal,* 29 April, 1822, 1 May 1822, 2 May 1822, Bengal Hurkaru, 15 October 1822.

৫৭। J.C.Ghose, op. cit., p. 195

৫৮। *D.P. Mazumder*, op. cit. pp. 219-220, 249-50
৫৯। J.C.Ghose, op. cit., pp. 18, 21, 22, 30, 53, 87-89, 97-98, 312.
৬০। G.K. Majumdar, ed., Raja Rammohun Roy & Progressive Movements in India, Calcutta, 1941, pp. 619-21.
৬১। *Rammohun's letter in the Reformer and the India Gazette dt.* 27 January 1833 and 28 January 1833 as well as in *Modern Review* June 1932, pp. 619-21.
৬২। Rammohun's *letter in Selected Works.* op. cit. pp. 297-297.
৬৩। *Oriental Herald.* July 1827.
৬৪। N.S. Bose, *Racism, Struggle for Equity and Indian Nationalism,* Calcutta 1981. pp. 21-23
৬৫। *Selected Works,* etc. op. cit. pp. 38-41
৬৬। N.S. Bose, *op.cit.* p. 24
৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ পৃ. ৩৬৭, ৩৭১-৩৭২
৬৮। J.K.Majumder, *Raja Rammohun Roy & Progressive etc.* op. cit. pp. 403-404.
৬৯। উ. গ্র. পৃপৃ. ৩০৬-৭০
৭০। উ. গ্র. পৃপৃ ২৭৮-৩১৯
৭২। উ. গ্র. পৃ. ২৮১
৭৩। উ. গ্র. পৃ. ২২১
৭৪। রামমোহন রায়, *চারি প্রশ্নের* উত্তর, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ব, সা, পরিষৎ, ১৩৮০, পৃ. ১৫ এবং পথ্য-প্রদান, উ. গ্র. পৃ. ১০৩। Brojendranath Seal, Rammohan Roy : The Universal Man in *Commemoration Volume*, op. cit. p. 104
৭৫। J.C. Ghose, op. cit., p. 43
৭৬। উ. গ্র. পৃ. ৪৬
৭৭। Durga Prasad Mazumder. op. cit., pp. 229, 253, (F.N. 194).
৭৮। J.C. Ghose, op. cit. pp. 49-50
৭৯। উ. গ্র. পৃপৃ. ৪৯-৫০
৮০। উ. গ্র. পৃপৃ. ১১-১২
৮১। উ. গ্র. পৃপৃ. ২৩-২৪
৮২। উ. গ্র. পৃপৃ. ১৩-১৪, ১৬
৮৩। Rammohun Roy, "The English in India should ... etc." in *Modern Review,* December, 1928, p. 636.
৮৪। J.C. Ghose, op. cit. p. 18
৮৫। উ. গ্র. পৃ. ১৪
৮৬। উ. গ্র. পৃ. ২২১
৮৭। উ. গ্র. পৃপৃ. ২৩, ২৭, ২৮, ৩০
৮৮। উ. গ্র. পৃপৃ. ৩২, ৩৩, ৩৪, ১৯৫-১৯৬, ২২২-২২৩, ৩১৮-১৯
৮৯। *Government Gazette*. 3 April 1823, *India Gazette 17 April, 1823*.
৯০। B.B. Majumdar, *History of India Social* etc. op. cit., p. 42
৯১। D. K. Biswas & P. C. Ganguly, eds., *op. cit.*, p. 419-20
৯২। *Commemoration Volume,* op. cit. p.3.

ঋণস্বীকার ঃ রামমোহন সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১২-১৬, ১৯৯৬।